পৃথিবীর নতুন মানচিত্র নির্মাণ

মাওলানা মাহমুদ হাসান হাফিজাহুল্লাহ

পৃথিবীর নতুন মানচিত্র নির্মাণ

মাওলানা মাহমুদ হাসান হাফিজাহুল্লাহ

প্রকাশকের কথা.....৪

ভূমিকা.....৫

পতনের কালগুলো:.....৬

উনবিংশ শতাব্দী: ঔপনিবেশিক যুগে মুসলিম উম্মাহ:.....৬

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ: খেলাফতে উসমানিয়ার পতনের পরে মুসলিম উম্মাহ.....৬

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ: নামসর্বস্ব স্বাধীনতার যুগ:.....৭

পতনযুগে গড়ে উঠা আন্দোলনগুলো এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গি:.....৭

জাতীয়তাবাদী মতবাদের পতাকাবাহী সংস্কার আন্দোলনসমূহ:.....৮

ইসলাম বাস্তবায়ন ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনগুলো:.....৯

মুসলিম ভূমিসমূহের নামসর্বস্ব আযাদি, জাতীয়তাবাদীদের শাসন এবং তাদের সাথে ও ইসলাম বাস্তবায়নের আন্দোলনগুলোর সাথে টানাপোড়ন:.....১০

একবিংশ শতাব্দীতে মুসলিম উম্মাহর উত্থান:.....১১

একবিংশ শতাব্দীতে মুসলিম উম্মাহর চার শত্রু আর মুসলিম উম্মাহর তিন অঙ্গন:.....১২

জিহাদী কর্মকাণ্ড অনুসারে পৃথিবীর মানচিত্র.....১৪

সময়ের ডাক:.....১৬

'জরবে আযাব' এর পরের পাকিস্তান এবং বর্তমানে এলাকার পরিস্থিতি:.....১৬

প্রকাশকের কথা

আল-কায়েদা উপমহাদেশ শাখার একটি প্রকাশনী "হিত্তীন" কর্তৃক উর্দু ভাষায় প্রকাশিত একটি ম্যাগাজিন "মাজাল্লায়ে হিত্তীন" এর ১৪৩৮ হিজরীর প্রথম সংখ্যায় "দুনিয়া কে নয়ে নক্বশে কী তা'মীর" শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন মাওলানা মাহমুদ হাসান হাফিজাহুল্লাহ।

প্রবন্ধটি মুসলিম উম্মাহর উত্থান-পতন এবং বর্তমান অবস্থা নিয়ে আমাদের নিকট অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও তথ্যবহুল মনে হয়েছে। তাই, আমরা বাংলাভাষী মানুষের জন্য এটি উপকারী হবে বিবেচনা করে এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করছি।

সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য। যিনি আমাদেরকে এই বরকতময় কাজটি করার এবং এর বাংলা অনুবাদ পাঠকের সামনে উপস্থাপন করার তাওফিক দান করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ।

আর আমরা পাঠকের কাছে দু'আ প্রার্থী- আল্লাহ তা'আলা যেন এই কাজটিকে আমাদের জন্য আখেরাতে নাজাতের ওসিলা বানিয়ে দেন, আমীন।

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূলের উপর এবং তার পরিবারবর্গ, সাহাবা ও যারা তার সাথে বন্ধুত্ব রাখে তাদের উপর।

আজ একবিংশ শতাব্দির দ্বিতীয় দশকে, যখন আমরা মুসলমান হিসাবে আমাদের আশপাশের বিশ্বটা পর্যবেক্ষণ করি, তখন হতাশার গভীর তলদেশ থেকেই আশার এক বিস্ময়কর অনুভব অন্তরে সৃষ্টি হয়। আশার এই অনুভব আমাদেরকে অতীতের সুউচ্চ জানালা থেকে নিয়ে যায় ভবিষ্যতের উজ্জল করিডোরে, যেখান থেকে উপরে উঠার গন্তব্য পরিদৃষ্ট হয়।

জি হ্যাঁ, আজকের বিশ্বের প্রতি যদি আমরা ঈমানী বিচক্ষণতার সাথে দৃষ্টি বুলাই, তাহলে আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস এসে যাবে যে, তিন শতাব্দী ধরে মুসলিম উম্মাহ যে পতনের শিকার ছিল, তা অতিসত্ত্বর শেষ হয়ে যাচ্ছে এবং উম্মতের উত্থান সুলিখিত ও সুনির্ধারিত। যে পতন কয়েক যুগ ধরে উম্মতের উপর দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে এবং যার মধ্যে মুসলমান কতগুলো নির্মমতার শিকার হয়েছে। ব্যক্তি জীবন থেকে নিয়ে সামাজিক জীবন পর্যন্ত টিকে থাকার জন্য তাকে অনেক চেষ্টা-পরিশ্রম করতে হয়েছে। আজ তার সেই চেষ্টা-পরিশ্রম ফল দিচ্ছে।

আজ উম্মাহর মুজাহিদগণ দুনিয়ার নতুন মানচিত্র নির্মাণ করছে। চৌদ্দশত বছরের অধিক পূর্ব থেকে চলে আসা চিরস্থায়ী জীবনব্যবস্থাকে নতুন করে দুনিয়াতে চালু করছে। ইতিহাসের সমাপ্তির দাবিদার ও 'সভ্যতার সংঘাত' এর প্রবক্তাদের মিথ্যাচারকে ব্যর্থ করে ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতিকে তার প্রকৃত আত্মায় পৃথিবীর চতুর্পার্শ্বে সুপ্রতিষ্ঠিত করছে।

আল্লাহর হুকুমে সেই সময় বেশি দূরে নয়, যেদিন আফগানিস্তান, সোমালিয়া, ইয়েমেন ও শাম থেকে বয়ে আসা 'প্রভাতি হাওয়া' বেইজিং, মস্কো, প্যারিস, লন্ডন ও ওয়াশিংটনকে নিজ বৃত্তের মধ্যে নিয়ে আসবে এবং পুরো বিশ্ব ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিবে। আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস আছে যে, আমাদের প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে সত্য বলেছেন। তিনি বলেছেন:

إِنَّ اللَّهَ زَوَى لِي الأَرْضَ فَأُرِيتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا

"আল্লাহ তা'আলা আমার জন্য পৃথিবীটাকে গুটিয়ে দিলেন। ফলে আমি তার পূর্ব-পশ্চিম দেখতে পেলাম। আর পৃথিবীর যতটুকু আমার জন্য গুটিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সে পর্যন্ত আমার উম্মতের রাজত্ব পৌঁছে যাবে।" - সহীহ্ মুসলিম, হাদিস- ২৮৮৯

এক হাদিসে আরো স্পষ্ট শব্দে বলেছেন:

لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، وَلَا يَتْرُكُ اللهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ هَذَا الدِّينَ، بِعِزِّ عَزِيزٍ أَوْ بِذُلِّ ذَلِيلٍ، عِزًّا يُعِزُّ اللهُ بِهِ الْإِسْلَامَ، وَذُلًّا يُذِلُّ اللهُ بِهِ الْكُفْرَ

"নিশ্চয়ই রাত-দিন যে পর্যন্ত পৌঁছেছে, এই দ্বীন সে পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। আল্লাহ কোন কাঁচা-পাকা ঘর ছাড়বেন না, প্রতিটি ঘরেই এই দ্বীন প্রবেশ করাবেন। সম্মানিত ব্যক্তির সম্মানের সাথে এবং লাঞ্ছিত ব্যক্তির লাঞ্ছনার সাথে। যে সম্মানের দ্বারা আল্লাহ ইসলামকে সম্মানিত করেছেন এবং যে লাঞ্ছনার দ্বারা আল্লাহ কুফরকে লাঞ্ছিত করেছেন।" - মুসনাদে আহমদ

ইউরোপের হৃদপিণ্ড পদানত হওয়ারও সুসংবাদ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে দিয়ে গেছেন:

عَنْ أَبِي قَبِيلٍ الْمَعَافِرِيِّ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَسُئِلَ أَيُّ الْمَدِينَتَيْنِ تُفْتَحُ أَوَّلًا قُسْطَنْطِينِيَّةُ أَوْ رُومِيَّةُ؟ قَالَ: فَدَعَا بِصُنْدُوقٍ طُهُمٍ - وَالطُّهُمُ الْخَلْقُ - فَأَخْرَجَ مِنْهَا كِتَابًا فَنَظَرَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكْتُبُ مَا قَالَ: فَسُئِلَ أَيُّ الْمَدِينَتَيْنِ تُفْتَحُ أَوَّلًا الْقُسْطَنْطِينِيَّةُ أَوِ الرُّومِيَّةُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَدِينَةُ هِرَقْلَ تُفْتَحُ أَوَّلًا» يَعْنِي الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ.

আবু কুবাইল থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আসের নিকট ছিলাম। তাকে প্রশ্ন করা হল: কোন শহরটি আমরা আগে বিজয় করবো, কনষ্টান্টিনোপল, নাকি রোম? তখন আব্দুল্লাহ একটি বাক্স নিয়ে আসতে বললেন, যেটার গোল বৃত্ত ছিল। তিনি তার থেকে একটি কিতাব বের করলেন। তারপর আব্দুল্লাহ বললেন: একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বসে লিখছিলাম। ইত্যবসরে তাকে জিজ্ঞেস করা হল, কোন শহর প্রথমে বিজিত হবে, কনষ্টান্টিনোপল, নাকি রোম? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: হিরাক্লিয়াসের শহর প্রথমে বিজয় করবে। অর্থাৎ কনষ্টান্টিনোপল। -মুসনাদে আহমাদ, মুসতাদরাকে হাকিম, দারামী, আল-ফিতান -নূআঈম বিন হাম্মাদ

এই হাদিস থেকে জানা গেল, ইটালীর শহর রোম, যেটা দীর্ঘ একটা সময় ধরে খৃষ্টবাদের কেন্দ্র, যেখানে ভেটিক্যানসিটি বিদ্যমান, সেটাও মুসলমানদের হাতে বিজিত হবে। রোম বিজিত হবে... তাহলে নিশ্চিতই প্যারিস, লন্ডন এবং তারপরে ওয়াশিংটনও বিজিত হবে, ইনশা আল্লাহ।

পতনের কালগুলো:

উত্থানের ব্যাপারে কথা বলা ও তার আলামতগুলো অনুসন্ধানের পূর্বে জরুরী হলো: নিজেদের পতনের পৃষ্ঠাগুলো উল্টানো। তখনই গিয়ে আমরা অনুমান করতে পারবো যে, কী পরিবর্তন দৃষ্টিগোচর হচ্ছে? কত দ্রুততার সাথে এবং কোন পন্থায় হচ্ছে...!

উনবিংশ শতাব্দীঃ ঔপনিবেশিক যুগে মুসলিম উম্মাহ:

আমাদের পতনের প্রথম স্তরটি ঔপনিবেশিক যুগের মাঝে পরিব্যাপ্ত, যখন পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো আঠার শতকে নিজেদের এলাকাগুলো ছেড়ে মুসলিম এলাকাগুলোর দিকে মনোযোগ দিল এবং মুসলিম উম্মাহর এক অংশের উপর আক্রমণ শুরু করে দিল। এ আক্রমণের ফলে উনবিংশ শতাব্দীতে মুসলিম উম্মাহর একটি অংশ পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। উপমহাদেশ, মিশর ও সুদানের উপর বৃটেন নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপগুলো উলনদাজিওদের হাতে চলে আসে। অপরদিকে আলজেরিয়া ও মরক্কোতে ফরাসীদের উপনিবেশ হল। আর মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলোকে রাশিয়া নিজের করদরাজ্য বানাল।

পশ্চিমা শক্তিগুলো নিজেদের কলোনীগুলোর মাধ্যমে ব্যাপক লুটপাট করে। সেখানে স্থানীয় লোকদের দিয়ে নিজেদের অনুগত বাহিনী তৈরী করে এবং এখানকার কর্মচারীদের সমন্বয়ে শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করে। এভাবে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর কর্তৃত্বাধীন মুসলিম এলাকাগুলোতে কুফর তার শিকড় মজবুত করে নেয় এবং এখানে সুদৃঢ় শাসনব্যবস্থা তৈরী করে ফেলে। যেহেতু এ কাজের জন্য তারা পুরো এক শতাব্দী পেয়েছিল। এ হল উনবিংশ শতাব্দীর কাহিনী।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ: খেলাফতে উসমানিয়ার পতনের পরে মুসলিম উম্মাহ

ওই সময় অবশিষ্ট বেশিরভাগ এলাকা খেলাফতে উসমানিয়ার অধীনে ছিল। খোদ খেলাফতে উসমানিয়া-ই বিগত এক শতাব্দীর ষড়যন্ত্রের কারণে দুর্বল হয়ে পড়েছিল এবং সর্বশেষ যুদ্ধ হিসাবে পশ্চিমা শক্তিগুলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধে উসমানীয়দের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধের ঘোষণা দেয়। চার বছরের যুদ্ধে উসমানীয়দের পরাজয় ঘটে। উসমানীয়দের নিয়ন্ত্রণ থেকে সমগ্র এলাকা ছিনিয়ে নেয়। আর অবশিষ্ট মুসলিম এলাকাগুলোও পশ্চিমা শক্তিগুলোর নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। বিশেষকরে মধ্যপ্রাচ্য, রোম উপসাগরের উপকূলবর্তী মুসলিম এলাকাগুলো এবং

আফ্রিকার নিম্নাঞ্চলের এলাকাগুলো সরাসরি পশ্চিমা শক্তিগুলোর প্রভাবাধীনে চলে আসে। কিন্তু সময়ের স্বল্পতা ও পৃথিবীর পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণে পশ্চিমা শক্তিগুলো এ সময় 'ম্যান্ডেট' ও 'প্রোটেকটরেট' এর পদ্ধতিতে উল্লেখিত এলাকাগুলোতে শাসন পরিচালনা করে। এই দ্রুততার কারণে তখন পশ্চিমা শক্তিগুলোর লক্ষ্য ছিল নিজেদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা এবং আরো অধিক লুটপাট করা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরিস্থিতিকে তাদের নিজেদের জন্যই ঘোলাটে করে দেয়। তখন বাধ্য হয়ে তাদের কাজের নতুন কৌশল অবলম্বন করতে হয়। এ সময় নি:সন্দেহে অবশিষ্ট মুসলিম এলাকাগুলোর উপরও পশ্চিমা কাফেরদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হয়ে যায়। কিন্তু এতটুকু উপকার হয় যে, তারা এখানে দীর্ঘ সময় পায়নি এবং নিজেদের শিকড় ও নিজেদের শাসনব্যবস্থার শিকড় মজবুত করতে পারেনি। মধ্যপ্রাচ্যের বেশিরভাগ আরব রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে নিজেদের ছত্রছায়ায় নামসর্বস্ব বাদশাহি বাকি রাখে। যার মধ্যে শরীফ বংশের হুসাইন, ফয়সাল ও আব্দুল্লাহর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ: নামসর্বস্ব স্বাধীনতার যুগ:

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যখন পশ্চিমা শক্তিগুলো দ্বিতীয়বার পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হল, তখন তাদের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের কর্তৃত্বাধীন মুসলিম এলাকাগুলোতে দুর্বল হতে লাগল এবং মুসলিম ভূমিগুলোতে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিভিন্ন আন্দোলন হতে লাগল। যেগুলোর ব্যাপারে আমরা সামনে কিছু আলোচনা করব। সর্বশেষে পশ্চিমা শক্তিগুলো নিজেদের পছন্দমত শাসকদেরকে মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দিয়ে প্রথমার্ধে নিজেদের স্বেচ্ছাচারিতা এবং পরে নামসর্বস্ব স্বাধীনতা প্রদান করে। আমরা যেকোন মুসলিম দেশের স্বাধীনতার ইতিহাস পাঠ করলেই পরিস্কার দৃষ্টিগোচর হবে যে, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনগুলো উস্কে দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিমা শক্তিগুলো জাতীয়তাবাদ-পূজারীদের হাতে শাসনক্ষমতা হস্তান্তর করে। যাতে তাদের ইজারাদারি ও অধীনস্ততা বাকি থাকে এবং কোথাও ইসলামী শাসনব্যবস্থার আওয়াজ উঁচু না হয়ে যায়।

আর যেখানে প্রয়োজন মনে হয়েছে, নিজেদের কর্মচারী পূর্ববর্তী অনুগত জেনারেলদেরকে মুসলিম দেশগুলোর উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। সিরিয়ায় হাফিজ আসাদ, ইন্দোনেশিয়ায় সোহার্তো, লিবিয়ায় মুআম্মার গাদ্দাফী, মিশরে জামাল আব্দুন নাসের, সাদাত ও হুসনি মোবারক, তিউনিসিয়ায় বিন আলী, তুরস্ক ও আলজেরিয়ায় বিভিন্ন সেনাবিপ্লব এবং পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসে জেনারেলদের ভূমিকা... এ সব তার সুস্পষ্ট আলামত। ফলস্বরূপ এই স্বাধীনতার অর্ধশত বছরেও ইসলাম রাজনীতি, শাসনক্ষমতা ও শাসনব্যবস্থার প্রধান উপাদান হতে পারেনি এবং মুসলিম উম্মাহর পতন রীতিমতই অব্যাহত থেকেছে।

পতনযুগে গড়ে উঠা আন্দোলনগুলো এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গি:

যে সময় মুসলিম উম্মাহ পতনোন্মুখ ছিল, তারা সর্বদিক থেকে দ্বীন ও মিল্লাতের শত্রুদের এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর গ্রাসের ভেতরে ছিল, তখন উম্মাহকে পতন থেকে বাঁচানোর জন্য কতগুলো আন্দোলন জন্ম লাভ করে। উম্মাহর পতনের ব্যাপারে জানার জন্য ওই আন্দোলনগুলো অধ্যয়ন করা নেহায়াত জরুরী। তাদের ব্যাপারে অধ্যয়নের জন্য আমরা তাদেরকে দু'টি মৌলিক ভাগে ভাগ করতে পারি। দেশ যেটাই হোক বা ব্যক্তি যে-ই হোক, সবগুলো আন্দোলনকে দু'টি প্রকারের মধ্যেই পরিদৃষ্ট হয়। উক্ত দুই প্রকার হল-

১। জাতীয়তাবাদী মতবাদের পতাকাবাহী সংস্কার আন্দোলনসমূহ।

২। ইসলাম বাস্তবায়ন ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনসমূহ।

জাতীয়তাবাদী মতবাদের পতাকাবাহী সংস্কার আন্দোলনসমূহ:

শত্রুর আক্রমণ ও তার ক্রমবর্ধমান বিজয় দেখে এক ধরণের আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছিল, যারা মুসলমানদেরকে এই পথ দেখানোর চেষ্টা করে যে, তারা যেন জাতীয়তার শক্তিতেই নিজেদের স্বাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে এবং এ দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতেই বিজয় অর্জনের পটভূমি তৈরী করে। তারপর এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনেরও দু'টি রূপ ধারণ করে। একটি রূপ হল, সম্পূর্ণ ধর্মহীনতার, যার মধ্যে আরব জাতীয়তা, তুরানী জাতীয়তা, ফার্সী জাতীয়তা ও ভারতীয় জাতীয়তার ধ্বনি উচ্চকিত হয়। এই আন্দোলনগুলোর পতাকাবাহীরা দ্বীনে ইসলামের অনুশাসন থেকে মুক্ত হওয়ার দাওয়াত দিত এবং লোকদেরকে নিজ বংশধরের সাথে যুক্ত হওয়ার বাণী শেখাত। এভাবে তাদেরকে মুক্তির পথ দেখাত।

উনবিংশ শতাব্দীতে আরব জাতীয়তার জন্য আরব খৃষ্টান ফারিস নমর, ইয়াকুব সুরূফ ও শাহীন মাকারিউস, তুরানী জাতীয়তার জন্য তুর্কি যুবশ্রেণী, ফার্সী জাতীয়তার জন্য ফতেহ আলী আখন্দ ও তার শীষ্য জালালুদ্দীন মিরযা কাযার এবং ভারতের প্রেক্ষাপটে এ জাতীয়তার জন্য কংগ্রেস দাঁড়িয়েছিল।

কিন্তু মুসলমানদের ইসলামী মর্যাদাবোধ এই আন্দোলনগুলোকে বেশিরভাগ ইসলামী দেশগুলোতে সফল হতে দেয়নি এবং মুসলমানগণ ধর্মবিরোধী জাতীয়তার মতবাদকে প্রত্যাখ্যান করে। আর ওই সকল লোকদেরকে ইসলাম ও মুসলমানদের দুশমন হিসাবেই জেনে নেয়। এ কারণে অধিকাংশ আন্দোলনগুলো আশানুরূপ সফল হতে পারেনি। তবে এতটুকু অবশ্যই করতে পেরেছে যে, মুসলমানদের মধ্যে বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে ব্যাপক বিক্ষিপ্ততার বীজ বপন করে দিতে এবং ভবিষ্যতের জন্য পথভ্রষ্টতার একটি প্রাথমিক ভিত্তি স্থাপন করে দিতে সক্ষম হয়।

হ্যাঁ, এক জায়গায় এ আন্দোলন ভূমিও পেয়ে যায়। মুসলমানদের হৃদপিণ্ড তুরস্কে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে পরাজিত খেলাফতের শিকড় খুঁড়ে তুর্কি জাতীয়তার নামে নতুন তুরস্কের গোড়পত্তন ওই সকল লোকদের হাতেই হয়।

যখন এ আন্দোলনগুলো মুসলমানদের মাঝে বেশি গ্রহণযোগ্যতা পেল না, তখন 'মুসলিম জাতীয়তা'র দর্শনের ভিত্তিতে বিভিন্ন আন্দোলন দাঁড় করানো হয়। এ আন্দোলনগুলো নিজেদের মধ্যে ইসলামের রং লাগিয়ে রেখেছিল মাত্র। কারণ এর পতাকাবাহীদের ইসলামের পুনর্জাগরণ উদ্দেশ্য ছিল না, বরং ইসলামের সাথে সম্পর্কের মাধ্যমে শুধু জাতীয়তার চিত্র এঁকে মুসলিম জাতীয়তার ভিত্তি নির্মাণের চেষ্টা-প্রচেষ্টাই উদ্দেশ্য ছিল।

বাস্তবতা এটাই যে, ইসলামের আকিদা ও বিধি-বিধানের প্রতি তাদের কোন আগ্রহই ছিল না। বরং তাদের মধ্যে অধিকাংশই পথভ্রষ্ট, এমনকি এর থেকেও সামনে বেড়ে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসগুলোর মধ্যে বিকৃতির কারণে কুফরের সীমা পর্যন্ত স্পর্শ করছিল।

আরব বিশ্বে জামালুদ্দীন আফগানী যার ভিত্তি স্থাপন করে, তাকে বিংশ শতাব্দীতে ত্বহা হুসাইন, হুসাইন হাইকল, ও লুতফী সাইয়্যেদ খুব ধুমধামের সাথে সামনে অগ্রসর করে। উপমহাদেশের প্রেক্ষাপটে তো সবাই জানে যে, জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তি স্থাপনকারী ছিল স্যার সৈয়্যদ আহমাদ খান। এ লোক নিজের বিশেষ যিন্দিকী দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা দ্বীনে ইসলামের চেহারা-ই পাল্টে দেয়। হ্যাঁ, বৃটিশদের পদলেহন করে মুসলমানদেরকে একটি আলাদা জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার কঠোর চেষ্টা করেছে। তারপর তার রাজনৈতিক রূপ হিসাবে 'অল ইন্ডিয়ান আর্মি' গঠিত হয় এবং সেটাই ভবিষ্যতে দ্বি-জাতি তত্ত্বের রূপ ধারণ করে।

ইসলাম বাস্তবায়ন ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনগুলো:

এক হাজার বৎসর পর্যন্ত পৃথিবীতে মুসলমানদের কর্তৃত্ব বজায় থাকার মূলভিত্তি ছিল: তাদের দ্বীনকে আঁকড়ে ধরা, তাকে দুনিয়াতে প্রভাবশালী রাখা এবং তাকে রক্ষার জন্য সতর্ক থাকা। সুতরাং যখন মুসলমানদের মধ্যে দুর্বলতা শুরু হতে লাগল এবং পশ্চিমা আগ্রাসনও শুরু হল, তখন মুসলমানদের মধ্যে উলামায়ে কেরাম ও মুজাহিদীনের দু'টি দল সময়ের প্রয়োজন বুঝে নিজ নিজ গণ্ডির ভিতর কাজ করে যেতে লাগলেন। যখন আঠার ও উনিশ শতকে প্রথম প্রথম পশ্চিমা শক্তিগুলোর হামলা শুরু হল, তখন উলামায়ে কেরাম, সুফিয়ায়ে ইযাম এবং সাধারণ মুসলমানগণ জিহাদকে নিজেদের পথ বানাল এবং দেখতে দেখতেই প্রতিটি অঞ্চলে জিহাদী আন্দোলন দাঁড়িয়ে যায়। রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে এশিয়া মাইনরে ইমাম গাজী ও ইমাম শামিল রহ. দাঁড়িয়ে গেলেন। আফ্রিকায় সানুশিরা নেতৃত্ব হাতে নেয় এবং উপমহাদেশে শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ. ও তার অনুসারীরা রণাঙ্গনে নেমে আসেন।

এ সকল জিহাদী সংগঠনগুলো একটা সময় পর্যন্ত মুসলমানদেরকে কাফেরদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করে মোকাবেলা করতে থাকে। কিন্তু পরিশেষে স্থানীয় মুরতাদদের গাদ্দারির কারণে সফল হতে পারেনি এবং পশ্চিমা শক্তিগুলোর প্রভাব আরো বেড়ে যায়। যখন বিংশ শতাব্দীর শুরুভাগে অধিকাংশ মুসলিম ভূখণ্ড পশ্চিমা কাফেরদের কর্তৃত্বে চলে যায়, তখন ওই আন্দোলনগুলোও এক নতুন রূপ ধারণ করে। এখন তারা ইসলামের জন্য যুদ্ধ করার সাথে সাথে ইসলাম বাস্তবায়ন ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু করে।

যেহেতু পশ্চিমাদের আধিপত্যের সাথে সাথেই মুসলমানদের হাজার বছরেরও অধিক সময় ধরে বিজয়ী থাকা শাসনব্যবস্থা ও জীবনাচারের পতন হয়ে গিয়েছিল, তখন তাকে নতুন করে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ইসলাম বাস্তবায়নের আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। সময়ের বিভিন্ন চাহিদার প্রেক্ষিতে জিহাদের চেয়ে বেশি দাওয়াতি পরিবেশেরই প্রাবল্য ছিল। তবে এমনটা হয়নি যে, জিহাদের মত ইবাদত তাদের উদ্দেশ্যের মধ্যেই ছিল না, বরং সময়ে সময়ে জিহাদ-যুদ্ধও তাদের কার্যতালিকায় ছিল।

মিশরে শহীদ হাসান আলবান্না ও শহীদ সাইয়্যেদ কুতুব রহ. এর ইখওয়ানুল মুসলিমীন, আলজেরিয়ায় শাইখ আব্দুল হামিদ ইবনে বাদিস রহ. এর 'জমিয়াতু উলামাইল জাযায়েরীন', উপমহাদেশে উলামায়ে দেওবন্দের 'জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ' ও 'জামাআতে ইসলামী' এ সমস্ত আন্দোলনেরই অন্তর্ভূক্ত। এ সমস্ত আন্দোলনগুলো মুসলিম দেশগুলোতে ইসলাম বাস্তবায়নের আওয়ায উঁচু করে। আর তার কর্মপরিকল্পনার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে স্বীকৃতি দেয় পশ্চিমা শক্তিগুলো থেকে মুক্ত হওয়া।

এ আন্দোলনগুলো মুসলিম জনসাধারণের আবেগের প্রতিফলন হিসেবে চলতে থাকে। কারণ মুসলমানদের অধিকাংশের অন্তরে ইসলামকে বিজয়ী হিসাবে দেখার আগ্রহ প্রবল ছিল এবং ইসলাম বাস্তবায়নের মাঝেই তারা তাদের জীবনের স্বার্থকতা দেখতে পেত। কিন্তু পশ্চিমা কুফরী শক্তিগুলো এই আন্দোলনগুলোর ভয়াবহতার ব্যাপারে অবগত ছিল এবং তারা জানত যে, তাদের হাতে ক্ষমতা যাওয়ার অর্থ হল, ভবিষ্যতে তাদের বিশ্ব শাসনের স্বপ্ন লজ্জাজনক ব্যাখ্যায় পরিণত হওয়া।

এ কারণেই তারা এ ধরণের আন্দোলনগুলো নির্মূল করার চেষ্টা করেছে। তারপর যখন বিংশ শতাব্দিতে দু'টি যুদ্ধের পরে তাদের কর্তৃত্ব মুসলিম বিশ্বের উপর দুর্বল হয়ে গেল এবং মুসলিম ভূমিগুলোতে স্বাধীনতার আওয়ায উচ্চকিত হতে লাগল, তখন পশ্চিমা শক্তিগুলো ইসলাম বাস্তবায়নের আন্দোলনগুলোর স্থলে জাতীয়তাবাদীদেরকে রাজনীতিতে প্রবেশ করাল, তারপর অধিকাংশ মুসলিম এলাকাগুলোতে তাদেরকেই ক্ষমতা দিয়ে নামসর্বস্ব আযাদির ডাকঢোল পিটাল।

মুসলিম ভূমিসমূহের নামসর্বস্ব আযাদি, জাতীয়তাবাদীদের শাসন এবং তাদের সাথে ও ইসলাম বাস্তবায়নের আন্দোলনগুলোর

সাথে টানাপোড়ন:

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর যখন মুসলিম ভূমিসমূহের স্বাধীনতার পর্যায় আসল, তখন এই স্বাধীনতার ফলশ্রুতিতে- যেমনটা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি- মুসলিম দেশগুলোতে ক্ষমতা জাতীয়তাবাদীদের হাতে চলে আসে। ইসলাম বাস্তবায়নের আন্দোলনগুলো যেহেতু নিজেদের লক্ষ্য বাস্তবায়নের প্রথম পদক্ষেপ বানিয়েছিল পশ্চিমা শক্তিগুলো থেকে স্বাধীনতাপ্রাপ্তি, এজন্য তারা কল্যাণ বিবেচনা করে প্রতিটি ভূমিতেই স্বাধীনতার পক্ষে সমর্থন দেয়। চাই তার ফলশ্রুতিতে জাতীয়তাবাদীরাই ক্ষমতায় আসুক না কেন। আর নিজেদের বিরোধের কেন্দ্রবিন্দু বানায় বহি:শত্রুগুলোকে।

আযাদির সময় জাতীয়তাবাদীরাও নিজেদের শক্তি অর্জনের জন্য ইসলামী আন্দোলনগুলোকে প্রতিশ্রুতি দেয় যে, আযাদির পরে ইসলামী শাসনব্যবস্থাই কার্যকর করবে। কিন্তু এটা তো নির্ভেজাল ধোঁকা ছিল। ওই জাতীয়তাবাদীরা ইসলামের নাম শুধুমাত্র খেলা হিসাবে ব্যবহার করেছে। এমনটাই হল। প্রতিটি দেশের ক্ষমতাসীন শ্রেণী সেই পশ্চিমা শক্তিগুলোরই আশ্রয়ে নিজ নিজ ক্ষমতা মজবুত করল এবং ওই সকল ইসলামী আন্দোলনগুলোকে নিজ নিজ দেশে নির্মূল করা শুরু করে দিল।

একবিংশ শতাব্দীর সূচনা পর্যন্ত অর্থাৎ স্বাধীনতার অর্ধ শতাব্দী পর্যন্ত এই টানাপোড়নের-ই ভূমিকা ছিল। মিশরে দেখুন, কিভাবে জামাল আব্দুন নাসের ক্ষমতায় আসতেই সাইয়িদ কুতুব রহ., আব্দুল কাদির আওদাহ রহ. ও অন্যান্য ইখওয়ানের নেতাদেরকে ফাঁসি দেয়। শামে হাফিজ আসাদ আসতেই ইখওয়ানের নেতাদেরকে গ্রেফতার করে এবং যখন তার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়, তখন শাইখ মারওয়ান রহ. ও ইসলামী আন্দোলনের হাজারো কর্মীকে শহীদ করে দেয়।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরই যখন শাসক শ্রেণী ইসলাম নিয়ে ছিনিমিলি খেলতে লাগল, তখন আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী রহ. তার বিরুদ্ধে মৌলিক আন্দোলনের সূচনা করেই ফেলেছিলেন, কিন্তু ইতিমধ্যেই তাকে বিষ দিয়ে দেওয়া হয়। পাকিস্তানে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মাত্র দু'বছর পর খতমে নবুওয়াত আন্দোলনের সময় হাজার হাজার মুসলমানকে শহীদ করা হয় এবং বড় বড় আলেমকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়।

এ তো কয়েকটি উদাহরণ। অন্যথায় যেকোন পর্যবেক্ষক অন্তরের চোখ দিয়ে এই অর্ধ শতাব্দীর ইতিহাস অধ্যয়ন করলে এ ধরণের উদাহরণ বিভিন্ন ইসলামী দেশের জায়গায় জায়াগায় দেখতে পাবে।

এই টানাপোড়নের ফলে কয়েকটি বিষয় সংঘটিত হয়, যেগুলোকে নিচে পয়েন্ট আকারে তুলে ধরা হল:

১। ইসলামী আন্দোলনগুলো শুরুর দিকে আযাদির সাহায্য করেছে এবং তার ফলশ্রুতিতে ক্ষমতাসীন জাতীয়তাবাদীদেরকেও সাহায্য করেছে আর তাদের থেকে এই প্রতিশ্রুতি নিয়েছে যে, তারা ইসলামী শাসনব্যবস্থা বাস্তবায়ন করবে। এভাবে প্রথমদিকে ইসলামী আন্দোলনগুলো শাসকশ্রেণীর সাথে সংঘাতের পরিবর্তে বৃহত্তর স্বার্থের পলিসি অবলম্বন করে এবং ক্ষমতা নিজেদের হাতে নেওয়ার পরিবর্তে তাদেরই সমর্থন করে।

২। কিন্তু পরে ইসলামী আন্দোলনগুলো অনুভব করে যে, শাসকশ্রেণী ইসলামের প্রতি আদৌ আন্তরিক নয়। বরং তারা বিশ্বশক্তিগুলোর প্রভাবাধীন মুসলিম দেশগুলোতে ইসলাম বিরোধী সেক্যুলার শাসনব্যবস্থা জারি করতে চাচ্ছে।

৩। যখন তাদের থেকে নিরাশ হয়ে গেল, তখন বিরোধিতা ও সংঘাতের আওয়ায উঁচু হল, যেগুলোকে শাসকশ্রেণী সেনাবাহিনীর মাধ্যমে দমন করা শুরু করল। এভাবে ইসলামী আন্দোলনগুলোর মধ্য থেকে একটি শ্রেণী শাসকশ্রেণীকে অভ্যন্তরীণ শত্রু সাব্যস্ত করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে দেয়। কিন্তু প্রথমদিকে দুর্বল, অপ্রশিক্ষিত ও শৃঙ্খলাহীন হওয়ার কারণে তাদের সফলতা লাভ হল না।

৪। ইসলামী আন্দোলনগুলোর সিংহভাগ অংশ শাসকশ্রেণীর জুলুম থেকে নিজেদেরকে বাঁচানোর জন্য এই পলিসি গ্রহণ করে যে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে সামাজিক জীবনে ইসলামী শাসনের পথ সমতল করা হবে এবং শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে আওয়ায তোলার জন্য জনগণকে গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করানো হবে।

৫। এ ক্ষেত্রে ইসলামী আন্দোলনগুলো দু'টি অংশে বিভক্ত হয়ে যায়। আর প্রতিটি নাজুক মুহূর্তে শাসকশ্রেণী বৈশ্বিক শক্তিগুলোর দিকনির্দেশনায় নিজেদের বিরোধী ইসলামী আন্দোলনগুলোকে নির্মূল করার জন্য গণতান্ত্রিক চেষ্টা-প্রচেষ্টাকারীদেরকে নিজেদের সাথে যুক্ত করে তাদের মধ্যে দেশত্ববোধের জাহেলী বীজ বপন করে দেয় এবং নিজেদের ও বৈশ্বিক শক্তিগুলোর ক্ষমতা সুদৃঢ় করে।

একবিংশ শতাব্দীতে মুসলিম উম্মাহর উত্থান:

এ কাহিনী এভাবেই চলছিল। এক পর্যায়ে রাশিয়া আফগানিস্তানে হামলা করল। আল্লাহ তা'আলার ফযল ও করমে রাশিয়ার এই হামলা মুসলিম উম্মাহর জন্য নব উত্থানের সূচনাকারী প্রমাণিত হল। বিশ্বব্যাপী ইসলামী আন্দোলনসমূহের সাথে সম্পর্কিত নওজোয়ানরা রাশিয়ার বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য আফগানিস্তান অভিমুখে রওয়ানা দিল।

যেহেতু আমেরিকারও ওই সময় রাশিয়ার পরাজয় উদ্দেশ্য ছিল, এজন্য সে নিজের দরজা উম্মুক্ত রাখল। সে নিজের পক্ষ থেকে চাল চালল। কিন্তু তার চাল তার উপরই উল্টে গেল।

রাশিয়ার বিরুদ্ধে সংঘটিত জিহাদ কয়েক দিক থেকে স্মরণীয়:

১। তার কারণে সমস্ত ইসলামী আন্দোলনগুলো এক বৈশ্বিক শত্রুর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়।

২। বৈশ্বিক শত্রুগুলোর বিরুদ্ধে মুসলিম উম্মাহর মাঝে জিহাদের দরজা খুলে গেল এবং বৈশ্বিক জিহাদী আন্দোলনের সূচনা হয়ে গেল। বিশ্বব্যাপী মুসলিম দেশগুলোর নওজোয়ানদের জিহাদের বাস্তব অভিজ্ঞতাও হয়ে যায়। উম্মতের নওজোয়ানদের জিহাদের প্রশিক্ষণ অর্জিত হয়ে যায় এবং ইতিপূর্বে তাদের মাঝে যে দুর্বলতা ও অনভিজ্ঞতার সমস্যা ছিল, তা আল্লাহর ফযলে দূর হয়ে যায়।

শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম রহ. সমগ্র উম্মতের নেতৃত্বের ভার বহন করেন এবং তাঁর শাহাদাতের পর এই নেতৃত্ব শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ. এর হাতে চলে যায়। রাশিয়ার পরাজয়ের পর শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ. পুরা উম্মতের সামনে একথা স্পষ্ট করেন যে, এখন পৃথিবীতে মুসলমানদের প্রথম শত্রু ও ইসরাঈলের রক্ষাকারী হল আমেরিকা ও তার তত্ত্বধানে যে সমস্ত পশ্চিমা দেশগুলো আছে তারা। তাই তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের সূচনা করা হোক।

এ পয়েন্টের উপর আল্লাহর ফযলে সমস্ত ইসলামী আন্দোলনগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায়। এই কর্মপদ্ধতিটিকে বাস্তবতার মুখ দেখানোর জন্য শাইখ উসামা রহ. এর নেতৃত্বে মুজাহিদগণ ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ এ আমেরিকার ভিতরে হামলা করেন এবং কয়েক হাজার আমেরিকানকে টার্গেট বানাতে সক্ষম হন। তাদের অর্থনৈতিক ও সামরিক কেন্দ্রকে টার্গেট বানান। এ ঘটনাটিও কয়েকটি বিষয় উম্মতে মুসলিমার সামনে স্পষ্ট করে তুলে: **"আমেরিকার নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক পশ্চিমা শক্তিগুলো মুসলিম উম্মাহর মোকাবেলার জন্য কাতারবদ্ধ হয়ে গেছে"**। এভাবে তাদের কুফর ইসলামী বিশ্বের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে যায় এবং ইসলামী আন্দোলনগুলো... যেগুলো প্রথমে দুই অংশে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল, তা

মুসলিম দেশগুলোর শাসকশ্রেণী ও সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে। এর দ্বারা মুসলিম দেশগুলোতে স্থানীয় সরকার ও সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে স্বশস্ত্র চেষ্টা-প্রচেষ্টার প্রসার ঘটে এবং মুসলমানগণ তার সাহায্যের জন্য দাঁড়িয়ে যেতে থাকে।

একবিংশ শতাব্দীতে মুসলিম উম্মাহর চার শত্রু আর মুসলিম উম্মাহর তিন অঙ্গন:

ধীরে ধীরে যুদ্ধের পরিধি বাড়তে থাকে। আফগানিস্তানে যে মোবারক জিহাদের সূচনা হয়েছিল, তা আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মদ ওমরের নেতৃত্বে ইমারাতে ইসলামিয়ার প্রতিষ্ঠা এবং তারপর আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিজয় পর্যন্ত পৌঁছে। এই জিহাদ আফগানিস্তানে বিজয়ধারা দেখিয়ে সোমালিয়া, ইয়েমেন ও শামেও বৃহৎ এলাকা মুজাহিদগণের ঝুলিতে ভরে দেয়।

এ যুদ্ধে যেখানে প্রথমে আমেরিকা, ইসরাঈল ও তাদের নেতৃত্বে ন্যাটোর দেশগুলো অন্তর্ভূক্ত ছিল, সেখানে স্থানীয় ধর্মবিদ্বেষী শাসকশ্রেণী ও সেনাবাহিনীও শত্রুর একেকটি অঙ্গ হয়ে যায়। তারপর রাশিয়াও ময়দানে অবতীর্ণ হয় এবং ইরানের নেতৃত্বে সমগ্র দুনিয়ার রাফেযীরাও আহলুস সুন্নাহর মোকাবেলায় নেমে আসে। এভাবে উম্মতের সামনে তাদের চার শত্রু প্রকাশ্যে চলে আসে:

১। আমেরিকা, ইসরাঈল ও ইউরোপীয়ান ব্লক।

২। রাশিয়া

৩। ইরানের নেতৃত্বে রাফেযী শক্তি।

৪। স্থানীয় মুরতাদ শাসক ও সেনাবাহিনী।

ইরান, যে গতকালমাত্র খোমেনী বিপ্লবের পর মুসলিম উম্মাহকে নিজেদের করদাতা বানানোর জন্য উম্মাহর দুশমনদেরকে হুমকি-ধমকি দিত, আজ সে-ই নিজের স্বার্থ ও রাফেযী অগ্নিপূজকদের জোশের বলে নিজের পূর্বসূরীদের ইতিহাস পুনর্জীবিত করত: উম্মাহর দুশমনদের কাতারে যুক্ত হয়। বরং তাদের জন্য সর্ববিষয়ে প্রথম সারির বন্ধুর ভূমিকা পালন করে।

২০০১ এ আফগানিস্তানে হামলার জন্য ইরান পর্দার আড়ালে আমেরিকার সঙ্গ দেয়। তারপর দু'বছর পর ২০০৩ সালে ইরাকের উপর হামলা করার জন্য আমেরিকাকে প্রকাশ্যে সঙ্গ দেয়। কয়েক বছর পর ২০০৮ এ ইয়েমেনের হুথিদেরকে প্ররোচিত করে এবং আল-কায়েদার মুজাহিদদের বিপরীতে ইয়েমেনের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার জন্য প্রস্তুত করে।

মাত্র এক বছর পর যখন মুসলিম উম্মাহ শামে বাশার আল-আসাদের মত রক্তপিপাসু হায়েনার বিরুদ্ধে ময়দানে নামে, তখন সেই ইরানই নিজ জেনারেলদেরকে বাশার আল-আসাদের সেনাবাহিনীর সাহায্যের জন্য প্রেরণ করে।

দ্বিতীয়ত: লেবাননের রাফেযী সংগঠন হিযবুল্লাহ, যা মূলত: হিযবুশ শয়তান- এটাকে বাশারের সাহায্যের জন্য যুদ্ধে অংশ নেওয়ায়।

তৃতীয়ত: বিশ্বব্যাপী ইরান রাফেযীদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে শামের যুদ্ধক্ষেত্রে আমেরিকা ও রাশিয়ার জুটিতে দাঁড় করিয়ে দেয়।

প্রকৃতপক্ষে ইরানও এখন প্রত্যক্ষ করছে যে, মুসলিম উম্মাহর উত্থান এখন ভাগ্যালিপিতে লিখিত বিষয়, আর মুসলমানদের উলামা ও মুজাহিদগণও উম্মাহকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য ময়দানে বিদ্যমান আছেন, যা ইরানের রাফেযী অগ্নিপূজারী মতবাদের মৃত্যুর সমার্থক। এজন্য এখন তারা মুনাফিকীর মুখোশ খুলে প্রকাশ্যে ইসলামের শত্রুতার চেহারা নিয়ে সামনে এসে পড়েছে।

এ সকল শত্রুতার মোকাবেলায় উম্মতে মুসলিমার নেতৃত্ব আন্তর্জাতিক জিহাদী আন্দোলনকে বেছে নেয় এবং দুনিয়াব্যাপী জিহাদি জামাতগুলো নিজ নিজ পরিধিতে শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করে দেয়। এ জিহাদগুলো তিন ধরণের রণক্ষেত্রে খুলে দেয়। এ রণক্ষেত্রগুলো সে রকম সামঞ্জস্যতার সাথেই চলতে থাকে, যেভাবে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে পশ্চিমা শক্তিগুলো মুসলিম এলাকাগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছিল।

যে মুসলিম এলাকাগুলোর উপর পশ্চিমা শক্তিসমূহের নিয়ন্ত্রণ দুর্বল ছিল, সেখানেই আলহামদু লিল্লাহ, সর্বপ্রথম জিহাদী আন্দোলন শক্তিশালী হয়েছে। তারপর ওই সমস্ত এলাকায় জিহাদী আন্দোলন দাঁড়িয়ে যায়, যেখানে পশ্চিমা শক্তিগুলো পূর্ণ শতাব্দী ধরে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে রেখেছিল। আর তৃতীয় ক্ষেত্র হিসাবে মুসলিম উম্মাহর যুবকরা পশ্চিমা দেশগুলোর ভিতরই জিহাদী কার্যক্রমের সূচনা করে দেয়। **এভাবে নিম্মোক্ত তিনটি ক্ষেত্র তৈরী হয়:**

১। ওই সকল এলাকা, যেগুলোতে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে পশ্চিমা শক্তিগুলোর প্রভাব বেশি ছিল না। এগুলোর মধ্য হতে পাঁচটি জায়াগায় জিহাদি আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে গেছে। আফগানিস্তান, সোমালিয়া, ইয়েমেন, সাহারা মরুভূমি ও শাম। আলহামদু লিল্লাহ, বর্তমানে এ পাঁচ এলাকায় অনেক বিস্তৃত এলাকা মুজাহিদগণের নিয়ন্ত্রণে আছে, যেখানে কুফরী শাসনব্যবস্থার কোন কর্তৃত্ব নেই।

২। ওই সকল দেশ, যেগুলোতে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে পশ্চিমা শক্তিগুলোর ক্ষমতা সুদৃঢ় ছিল। তার মধ্য থেকে পাকিস্তান, আলজেরিয়া, লিবিয়া, চেচনিয়া, মিশর, মালি, কেনিয়া, সৌদি আরব ও তিউনিসিয়ায় জিহাদী আন্দোলন শুরু হয়েছে এবং তারা সমাজে নিজেদের সমর্থন সৃষ্টি করছে, আলহামদু লিল্লাহ।

৩। তৃতীয় ক্ষেত্র হিসাবে পশ্চিমা দেশগুলোর মধ্যে মুজাহিদগণ জিহাদি কর্মকাণ্ড শুরু করে দিয়েছেন। যার মধ্যে আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, স্পেন ও রাশিয়ায় আল্লাহ তা'আলার ফযল ও করমে কয়েকটি অভিযান হয়েছে এবং এই ধারাবাহিকতা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

এ সমস্ত দৃশ্যাবলীকে যদি আমরা চিত্রের মধ্যে দেখি, তখন এক আনন্দদায়ক অনুভূতি অন্তরের মধ্যে এই সৃষ্টি হয় যে, মুজাহিদদের শক্তির এলাকাগুলোর আশপাশের মুসলিম দেশগুলোতেও জিহাদী আন্দোলন শক্তিশালী হচ্ছে এবং তারও সামনে এগিয়ে মুজাহিদগণ ইউরোপীয়ান দেশগুলোকেও নিজেদের আন্দোলনের পরিধির মধ্যে নিয়ে আসছেন। সোমালিয়া ও পূর্ব আফ্রিকায় ইসলামের উত্থানের কেন্দ্র সৃষ্টি হচ্ছে। সাহারা মরু ও পশ্চিম আফ্রিকায় কেন্দ্র তৈরী হচ্ছে। আফগানিস্তান থেকে দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়ায় মুজাহিদগণের শক্তি মজবুত হচ্ছে। ইয়েমেন থেকে আরব উপদ্বীপ ও আরব-আমিরাতের রাষ্ট্রগুলোতে উম্মাহর শক্তি যোগ হচ্ছে। অপরদিকে শাম মধ্যপ্রাচ্যের কেন্দ্র হয়ে যাচ্ছে। এমনকি তার প্রতিবেশী ইসরাঈলেরও নিজেদের প্রতিরক্ষায় আশঙ্কার সৃষ্টি হয়ে গেছে। আমাদের প্রথম কেবলা ও বাইতুল মুকাদ্দাস ফিরে পাওয়ার পথ সুগম হচ্ছে এবং পরবর্তীতে শাম-ই ইউরোপে জিহাদের করিডোর প্রমাণিত হচ্ছে। সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহর জন্য।

অপরদিকে এই অনুভূতি অন্তরে হিম্মত বাড়িয়ে দেয় যে, এ সমস্ত এলাকাগুলোতে আস্তে আস্তে ইসলামী আন্দোলনগুলোর সকল শাখাগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। যারা গতকাল পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ চেষ্টা-মেহনতকে আসল সমাধান মনে করত, আজ তারাও গণতান্ত্রিক রাজনীতি ছেড়ে ওই সকল এলাকায় জিহাদী আন্দোলনের সহকারী হচ্ছে এবং কয়েক জায়গায় তার অংশও হচ্ছে।

ইয়েমেনের কাবায়েলী এলাকাগুলো এবং বিভিন্ন ইসলামী আন্দোলন ও গণ্যমান্য উলামায়ে দ্বীন 'আনসারুশ শরীয়াহ'র ছায়াতলে একত্রিত হচ্ছে। সোমালিয়ায় ইসলামী আদালতের আন্দোলন থেকে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে হতে হরকাতুশ শাবাব আলমুজাহিদীনের রূপ ধারণ করে ফেলে, যা বর্তমানে সোমালিয়ার ৮০% এলাকা নিয়ন্ত্রণ করছে। বরং তার থেকেও সামনে ভারত সাগরের উপকূল হয়ে কেনিয়া পর্যন্ত মুসলমানদের প্রতিরক্ষার জন্য লঙ্গর ফেলছে।

শামে সালাফী, ইখওয়ানী, কুতুবী, সুফী সকল শ্রেণী বাশার আল-আসাদ, রাশিয়া, আমেরিকা ও ইরানের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ও এক কাতারে চলে এসেছে। আলহামদু লিল্লাহ, এ সকল দৃশ্যাবলী বলে দিচ্ছে যে, দুই শতাব্দীর পতনের পর একবিংশ শতাব্দীতে মুসলিম উম্মাহ পুনরায় উত্থানের দিকে এগুচ্ছে এবং আল্লাহর অনুগ্রহে মুসলিমগণ পৃথিবীর নতুন মানচিত্র নির্মাণ করছে, যাতে ইসলামের বিস্তৃতি পূর্ববর্তী যুগগুলো থেকেও বেশি দৃষ্টিগোচর হবে, ইনশাআল্লাহ।

জিহাদী কর্মকাণ্ড অনুসারে পৃথিবীর মানচিত্র

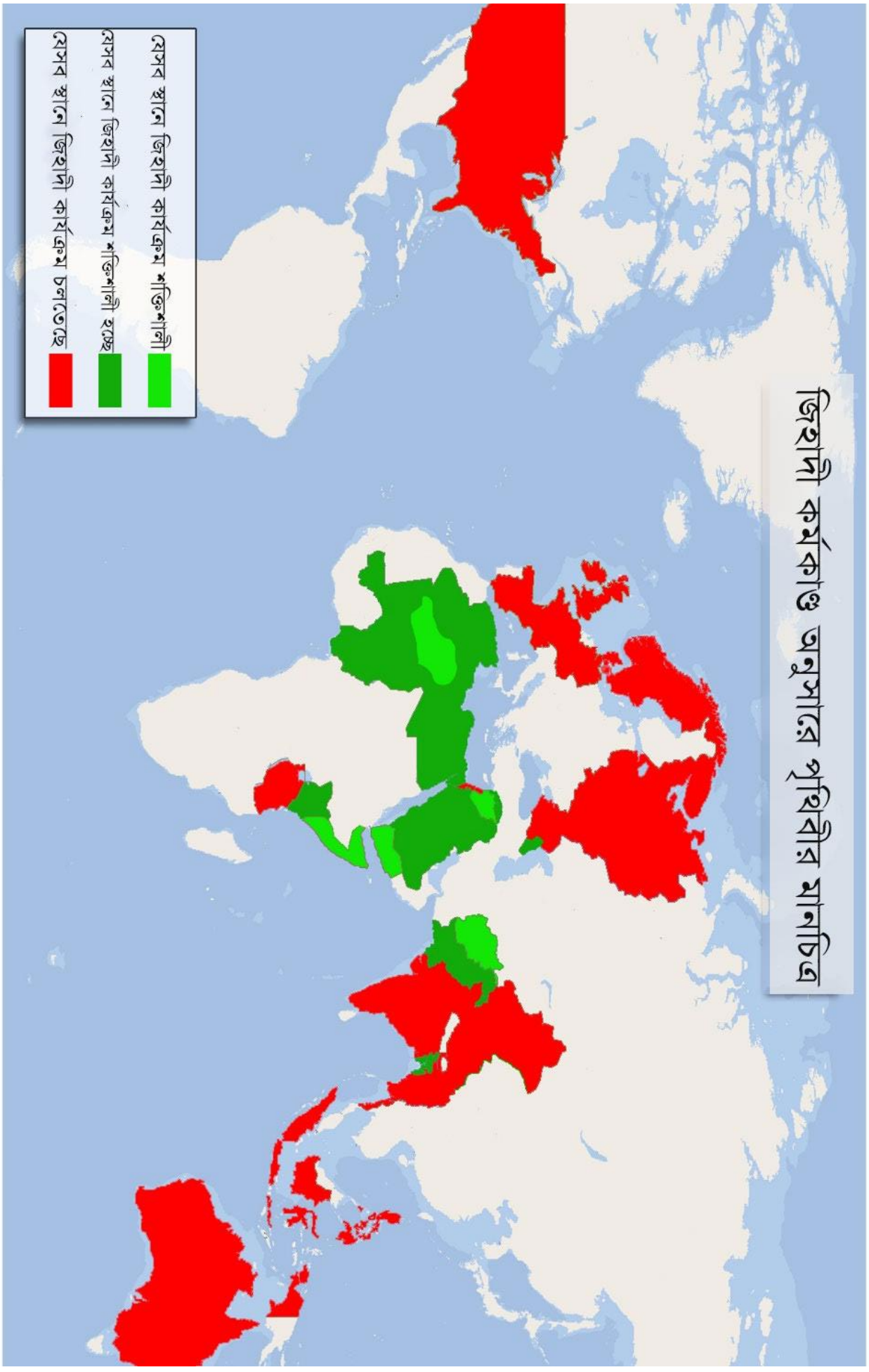
জিহাদী কর্মকাণ্ড অনুসারে পৃথিবীর মানচিত্র
যেসব স্থানে জিহাদী কার্যক্রম শক্তিশালী
যেসব স্থানে জিহাদী কার্যক্রম শক্তিশালী হচ্ছে
যেসব স্থানে জিহাদী কার্যক্রম চলতেছে

সময়ের ডাক:

নিজ জাতি, বিশেষত: উপমহাদেশের মুসলমানদেরকে এই চিত্র দেখানোর উদ্দেশ্য হল,

প্রথমত আমরা মুসলমান হিসাবে নিজেদের নীচুতা ও পশ্চিমাদের উচ্চতার অনুভূতি নিজেদের মন-মস্তিস্ক থেকে বের করে দেই। পশ্চিমাদের হাতের খেলনা মিডিয়াগুলোর দাজ্জালীপনা অনুভব করি এবং প্রকৃত সংবাদের ব্যাপারে অবগত হই।

দ্বিতীয়ত প্রকৃত সংবাদ জানার পর মুসলিম উম্মাহর উত্থানের জন্য প্রয়োজনীয় নিজ নিজ ভূমিকা জানি এবং এই সেই ভূমিকা পালনের জন্য কোমর বেঁধে নামি। এটা নিশ্চিত যে, উম্মাহর উত্থানের জন্য তার একটি দল নিজেদের দুনিয়া কুরবানী করে রেখেছে এবং যে দৃশ্য আমরা দেখছি, এটা যে কত যুবকের রক্তে রঙ্গীন হয়েছে, কত মা নিজের কলিজার টুকরোকে উৎসর্গ করেছে, কত বোন নিজের ভালবাসার বিচ্ছেদ সহ্য করেছে, তার ইয়ত্তা নেই। তারপরই দুনিয়ার মানচিত্রে পরিবর্তন আসছে। কিন্তু সবেমাত্র মানচিত্রে রঙ্গ লাগানো শুরু হয়েছে, তাকে তার চূড়ান্ত গন্তব্যে নিয়ে যেতে হবে।

সময়ের ডাক এই যে, ইসলামের উত্থান ও দুনিয়ার এই মানচিত্র নির্মাণে প্রতিটি দেশের মুসলমান ব্যক্তিগতভাবে ও দলীয়ভাবে কি পরিমাণ কুরবানীর জন্য প্রস্তুত? এই উত্থান এখনই পরিপূর্ণ হতে যাচ্ছে। কিন্তু প্রয়োজন হল, মুসলিম উম্মাহর প্রতিটি শ্রেণী- চাই সে সাধারণ সদস্য হিসাবে হোক, কিংবা সে আলিম-তালিবুল ইলম হিসাবে হোক, কিংবা কোন ইসলামী আন্দোলন হিসাবে হোক- ইসলামের শত্রুদের মোকাবেলায় উম্মাহর মুজাহিদীনের সঙ্গে শামিল হয়ে যাওয়া।

পশ্চিমা কাফেরগোষ্ঠী এবং আমাদের দেশগুলোর পশ্চিমা গোলামরা সন্ত্রাসবাদের ধ্বজা তুলছে, মুজাহিদগণকে লাখো বার সন্ত্রাসী বলছে এবং মুসলিম দেশগুলোতে দেশাত্ববোধের নামে শাসকশ্রেণী ও সেনাবাহিনীর বড়ত্বের কবিতা গেয়ে চলছে... তাই প্রতিটি মুসলমানের উচিত, জীবন দিয়ে তাদেরকে 'না' বলে দিবে এবং শুধুমাত্র এক আল্লাহর সামনে নত হয়ে এই বিজয়ী কাফেলায় মুজাহিদগণের সাথে শরীক হয়ে যাবে।

বিশেষত: ইসলামী বিশ্বে কর্মরত ওই সকল ইসলামী জামাত ও আন্দোলনসমূহ, যারা শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক প্রচেষ্টার প্রবক্তা, তারা গণতান্ত্রিক রাজনীতি থেকে মুক্ত হয়ে যে সমস্ত দেশে জিহাদী সংগঠন এখনো প্রাথমিক স্তরে আছে, ওই সমস্ত জিহাদী আন্দোলনগুলোর জন্য সমাজে যাত্রা সুগম করার দায়িত্বটুকু পালন করবে। তারা নিজেরা যদি জিহাদের ময়দানে নাও আসতে পারে, অন্তত সমাজে দ্বীনের শত্রু আমেরিকা, পশ্চিমা বিশ্ব, স্থানীয় শাসকশ্রেণী ও সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে মাঠ প্রস্তুত করার চেষ্টা শুরু করে দিবে এবং সমাজে দ্বীনের বিধি-বিধান পুনর্জীবিত করার চেষ্টা শুরু করে দিবে। যাতে উম্মাহর উত্থানের দীর্ঘ পথে ইসলামী আন্দোলনসমূহের সকল শ্রেণীর চেষ্টা-প্রচেষ্টাগুলো এক ধারায় চলে আসে এবং তাদের আপসের মাঝে দলাদলি সৃষ্টি না হয়। যদি আমরা এটা করতে পারি, তাহলে নিশ্চিত উম্মতের বিজয়ের সফর খুব শীঘ্রই শেষ হয়ে যাবে। অন্যথায় তা তো পূর্ণতায় অবশ্যই পৌঁছবে আল্লাহর হুকুমে, কিন্তু একটু বিলম্ব হবে।

'জরবে আযাব' এর পরের পাকিস্তান এবং বর্তমানে এলাকার পরিস্থিতি:

জুলাই ২০০৭ সালে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ইসলামাবাদের লাল মসজিদে হামলা করে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীদেরকে শহীদ করে। কারণ শুধু এটাই ছিল যে, লাল মসজিদ পাকিস্তানে ইসলামী শরীয়ত বাস্তবায়নের পথ সুগম করা শুরু করে দিয়েছিল এবং এক প্রকার রাজনৈতিক পদ্ধতিতে সমাজে সংস্কার কাজ শুরু করে দিয়েছিল। পাকিস্তান রাষ্ট্রের এটা সহ্য হল না যে, বৈশ্বিক শক্তিগুলোর পালিত গণতন্ত্র থেকে সরে পাকিস্তানে ইসলামী শরীয়ত বাস্তবায়নের আন্দোলন রাজনৈতিক মর্যাদা অর্জন করে ফেলবে।

পাকিস্তানের ইতিহাসে এটা কোন প্রথম ঘটনা ছিল না যে, শরীয়তের প্রহরীদেরকে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ছিন্নভিন্ন করে দেয়। বরং তার প্রতিষ্ঠা থেকেই এই ধারাবাহিকতা চলে আসছে।

১। ১৯৪৭ সালে বেলুচ মুসলিমগণ শরীয়ত বাস্তবায়নের কাজে নিজেদেরকে যুক্ত করেছিল, তখন সরকারের অনুমতিতে সেনাবাহিনী তাদের উপর হামলা করে শাস্তি দেয়।

২। ১৯৪৮ এ ফকীর আইপি রহ. এর নেতৃত্বে ওয়াযিরিস্তানে মুসলমানগণ শরীয়ত বাস্তবায়নের দাবিতে নিজেদেরকে সরগরম করে, তখন পাকিস্তানী সেনাবাহিনী তাদের মজলিসগুলোর উপর বোমা বর্ষণ করে।

৩। ১৯৫৩ সালে পাকিস্তানের মুসলমানগণ খতমে নবুওয়াতের স্বীকৃতির জন্য আন্দোলন করে, তখন সরকারের অনুমতিতে সেনাবাহিনী দশ হাজারের অধিক মুসলমানকে শহীদ করে। তারপর ভুট্টো ও জিয়ার যুগেও সেভাবেই খতমে নবুওয়াতের দাবিদারদেরকে কট্টরতার টার্গেট বানানো হয়।

৪। জিয়ার যুগে পাকিস্তানে রাফেযীদের প্রভাবের বিরুদ্ধে মাওলানা হক নাওয়ায জঙ্গী রহ. আন্দোলনের ডাক দেন, তখন ওই আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত নেতৃবৃন্দ ও যুবকদেরকে হত্যার ক্রমধারা শুরু হয়ে যায়।

৫। ১৯৯০ এ সোয়াতবাসী শরীয়তে মুহাম্মদী বাস্তবায়নের আন্দোলন শুরু করে, তখন সেখানে একের পর এক অপারেশন চালিয়ে উলামা, তলাবা ও সাধারণ দ্বীনদার শ্রেণীকে শহীদ, গ্রেফতার ও গুম করা হয়।

৬। তারপর যখন লাল মসজিদের উলামা এবং ছাত্র-ছাত্রীগণ আন্দোলন শুরু করে, তখন পাকিস্তানী সরকার ও সেনাবাহিনী নিজেদের পূর্ববর্তী নীতি অনুযায়ী ওই আন্দোলনকে নির্মূল করার জন্য সেনা অপারেশন চালায় এবং বোরকাবৃত মুসলিম বোনদেরকে রক্তে রঞ্জিত করে।

এ সকল আন্দোলনগুলোতে দুশমনের মোকাবেলায় অস্ত্র উঠানো হয়নি, বরং নিরস্ত্র শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক চেষ্টা চালানো হয়েছে। কিন্তু সমগ্র বিশ্বের ন্যায় পাকিস্তানেও এমন কোন চেষ্টা-প্রচেষ্টাকে উহআহ করতে দেওয়া পশ্চিমা শক্তিগুলোর সংবিধানে নেই, যারা তাদের প্রতিপালিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অংশ না হবে। সমগ্র বিশ্বের ইসলামী আন্দোলনগুলোকে গণতন্ত্রের জালে ফাঁসানোর উদ্দেশ্য হল, ওই সমস্ত আন্দোলনগুলোকে নিজেদের করায়ত্বে রাখা। কারণ আমেরিকা ও পশ্চিমা শক্তিগুলো জানে যে, যেই ইসলামী আন্দোলনই পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্বের দাবিদার এবং 'জন আইন' পাসের পতাকাবাহী হয়ে যাবে, তখন তারা নিজেরাই তাদের (কাফেরদের) পথের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। আর এ পথে তো আদৌ ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার প্রশ্নই উঠে না। এ কারণেই পাকিস্তানী তাগুতরা এ সকল ইসলামী আন্দোলনগুলোকে সর্বদা-ই নির্মূল করেছে, যারা গণতান্ত্রিক গণ্ডির ভেতর অন্তর্ভূক্ত হয়নি।

কিন্তু লাল মসজিদের ঘটনা পাকিস্তানী ইতিহাসের ধারা বদলে দেয়। এ ঘটনার পর এখানকার দ্বীনদার শ্রেণী নতুন পথ অবলম্বন করে। পাকিস্তানের উপর চেপে বসা শাসকশ্রেণী ও সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের সূচনা করে। এই যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর আল্লাহর ফযল ও করমে দ্বীনদার শ্রেণী এই আন্দোলনের সহযোগী হয়ে যায় এবং দেখতে দেখতেই পাকিস্তানে মুজাহিদীনের শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে।

এর মোকাবেলার জন্য আমেরিকা পাকিস্তানকে অনেক সাহায্য করেছে, অত্যাধুনিক অস্ত্র সরবরাহ করেছে, প্রশিক্ষণ দিয়েছে, পাকিস্তানী সেনাবাহিনী নিজেদের শত্রু তালিকার মধ্যে ভারতের পরিবর্তে মুজাহিদীনকে নিজেদের প্রথম শত্রু হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং এভাবে

একটি যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। কিছু যুদ্ধে মুজাহিদগণ জয়লাভ করেন, আর কিছু যুদ্ধে দ্বীনের দুশমনদেরও জয় হয়। অবশেষে ২০১৪ এর জুনে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী চূড়ান্ত হামলা করার প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং জরবে আযাব নামে অপারেশন শুরু করে।

এই অপারেশনের ফলে মুজাহিদীনের এলাকাগুলোতে সেনাবাহিনী হামলা করার পাশাপাশি শহুরে এলাকাগুলোতেও মুজাহিদীনের পৃষ্ঠপোষকতাকারী দ্বীনদার শ্রেণীর বিরুদ্ধে অপারেশন শুরু হয়। মুজাহিদগণ কৌশল অবলম্বন করে সাময়িকভাবে পিছিয়ে যান। যাতে নিজেদের শক্তির হেফাজত হয় এবং দ্বিতীয়বার সংঘটিত হয়ে হামলা করা যায়। শহুরে এলাকাগুলোতে সেনাবাহিনী এবং সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্র দ্বীনদার শ্রেণীর বিরুদ্ধে পরিবেশ সংকীর্ণ করতে থাকে এবং অগণিত যুবকদেরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে। অনেককে আদালতের বাইরে কৃত্রিম মোকাবেলার মাধ্যমে শহীদও করে এবং জনসাধারণের মাঝে ব্যাপক আতঙ্ক সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। এর ফলে সাময়িকভাবে এক থমথমে পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে যায়, যাকে সরকার ও সেনাবাহিনী নিজেদের বিজয় বলে স্বীকৃতি দিয়ে খুশিতে বাগ বাগ হয়ে যায়।

আমরা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করি যে, এটা পানির একটি আকস্মিক স্রোত মাত্র, যা দ্রুত গতিতে উপরে চলে এসেছে এবং মুহূর্তেই শেষ হয়ে যাবে। এ পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের উলামা, তালাবা ও দ্বীনদার শ্রেণীর সামনে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হওয়া জরুরী:

প্রথম কথা হল: আলহামদু লিল্লাহ, পাকিস্তানে শরীয়ত বাস্তবায়নের আন্দোলনের শক্তি প্রতিবেশী আফগানিস্তানে ইমারাতে ইসলামীয়ার শক্তির সাথে যুক্ত। যতই ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান শক্তিশালী ও সুদৃঢ় হবে, ততই পাকিস্তানেও শরীয়ত বাস্তবায়নের আন্দোলন শক্তিশালী হতে থাকবে এবং মুজাহিদীনের শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

আর এখন তো আফগানিস্তানে প্রতিটি নতুন সূর্য্য উঠার সাথে সাথেই ইমারাতের শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে, তার ফলাফলও তার সাথেই অগ্রসর হতে থাকবে। তাই কাবায়েলী এলাকাসমূহ থেকে মুজাহিদীনের সাময়িক পিছু হটার কারণে যদিও শূণ্যতা সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু ইমারাতের শক্তিশালী হওয়ার দ্বারা তা দ্বিতীয়বার পুরা হয়ে যাচ্ছে। আর শক্তিশালী হওয়ার কারণে কাবায়েলী এলাকাও খুব দ্রুত দ্বিতীয়বার মুজাহিদীনের হাতে চলে আসবে, ইনশাআল্লাহ।

দ্বিতীয় কথা হল: জরবে আযাবের মাধ্যমে পাকিস্তানী শাসক ও জেনারেলরা সাধারণ ও বিশেষ দ্বীনদার শ্রেণীকে শক্তির মাধ্যমে দমন করার চেষ্টা করছে আর তারা এটা প্রচার করছে যে, তারা মুজাহিদীনের শক্তি ভেঙ্গে দিয়েছে। যাতে পাকিস্তানের দ্বীনদার শ্রেণীর হিম্মত বসে যায় এবং পাকিস্তানে শরীয়ত বাস্তবায়নের জন্য যুদ্ধের পৃষ্ঠপোষকতা থেকে তারা ফিরে আসে।

এমতাবস্থায় দ্বীনদারগণের উচিত, তারা যেন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দিকে দৃষ্টিপাত করে, যার আলোচনা আমরা উপরে করেছি। আর তার মাধ্যমে নিজেদের হিম্মতকে নতুন করে তাজা করে ও সামনে আগত বিজয়ের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। সাময়িক চাপের কারণে যেন দমে না যান।

তৃতীয় কথা হল: সেনাবাহিনী এক্ষেত্রে একটি কূটনৈতিক খেলা খেলেছে, তা হল, পাকিস্তানের দ্বীনদার শ্রেণীরই মধ্য থেকে 'পাকিস্তানিয়্যত' এর চেতনাধীন একটি আওয়ায উঠায় এবং তার মাধ্যমে মুজাহিদীনের আন্দোলনকে পাকিস্তানের সাথে শত্রুতা প্রমাণিত করেছে এবং নিজেদেরকে পাকিস্তানের রক্ষক বলার চেষ্টা করেছে। এটা একটা গভীর ষড়যন্ত্র, যার ব্যাপারে উলামা ও তলাবাদের খবর রাখা আবশ্যক। আমরা এ ব্যাপারে স্পষ্ট করেছি যে, মুসলিম দেশগুলোতে ইসলামী আন্দোলনগুলোর উদ্দেশ্য হল শরীয়ত বাস্তবায়ন করা। আর শাসকশ্রেণী সর্বদাই এ পথে বাঁধা হয়ে থেকেছে।

দীর্ঘ সময় পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ চেষ্টা-প্রচেষ্টার পর আজ সেই একই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য যুদ্ধের দরজা খোলা হয়েছে। পাকিস্তানেরও একই ব্যাপার। পাকিস্তান ইসলামের নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু এখানকার ক্ষমতাসীন শ্রেণী ও জেনারেলরা এক দিনের জন্যও এখানে ইসলাম

আসতে দেয়নি। এটা এমন বাস্তবতা, যার প্রমাণের জন্য স্বয়ং ইতিহাসই সাক্ষী। ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ এর পর পাকিস্তানী সেনারা আমেরিকার ঝাণ্ডাতলে রীতিমত যুদ্ধ শুরু করে দেয়। আর তারই মোকাবেলা করার জন্য উলামায়ে দ্বীনের ফাতওয়ার আলোকে যুদ্ধ শুরু করা হয় এবং ঐ সকল লোকই শুরু করেন, যাদের অতীত জানাশোনা। যুদ্ধের ফাতওয়া দানকারী উলামাগণও সব মহলের পরিচিত ও জানাশোনা ছিলেন। যারা যুদ্ধ করেছেন, তাদের অতীতও রাশিয়া ও আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদের ব্যাপারে পরিচিত।

মিডিয়ার মাধ্যমে লাখো বার তাদেরকে আমেরিকা ও ভারতের এজেন্ট প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু জনগণ জেনে গেছে যে, আমেরিকার এজেন্ট তো স্বয়ং শাসকশ্রেণী ও সেনাবাহিনীর জেনারেলরা, মুজাহিদগণ নন। এই মুজাহিদগণের তো উদ্দেশ্যই হল পাকিস্তানকে তার দুশমনদের থেকে পবিত্র করা, যারা শাসক ও জেনারেলের ভূমিকায় দেশের উপর চেপে আছে এবং এতদ্বাঞ্চলে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার পথে বাঁধা হয়ে আছে। 'পাকিস্তানিয়্যাত' এর চেতনার তো দাবি ছিল এই যে, এখানে শরীয়ত বাস্তবায়নের জন্য যত চেষ্টা করা হয়, প্রতিটার সাহায্য করা হবে। চাই তা যবান দ্বারা হোক কিংবা হাত দ্বারা হোক। এটা তো নয় যে, শরীয়তের দুশমনদেরকেই সাহায্য করা হবে।

এমনিভাবে এই প্রোপাগাণ্ডাও করা হয়েছে যে, পাকিস্তানে সরকার, সেনাবাহিনী ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে লড়াইকারী সে সকল লোকেরাই, যারা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠারই বিরোধী ছিল। এটাও ভিত্তিহীন অভিযোগ। পাকিস্তানে কুফরী শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারীরা তো সেই দৃষ্টিভঙ্গির আলোকেই যুদ্ধ করছে, যার ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এটা সেই পাকিস্তান আন্দোলনেরই ধারাবাহিকতা, যার পরিচালনাকারী আল্লামা শাব্বির আহমাদ উসমানী রহ., আল্লামা যফর আহমাদ উসমানী রহ. এবং মাওলানা দাউদ গজনবী রহ. ছিলেন।

চতুর্থ কথা হল: পাকিস্তানে যে সমস্ত ধর্মীয় দল গণতান্ত্রিক রাজনীতির অংশ হয়ে আছে, তাদের উচিত বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট বুঝা। এই শতাব্দীতে জেগে উঠা ইসলামী আন্দোলন, তথা আন্তর্জাতিক জিহাদী আন্দোলনের অংশ হওয়া এবং গণতান্ত্রিক রাজনীতিকে বিদায় জানানো।

বলুন, যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার গোড়াপত্তন করেছে গোলামীর যুগে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো, তার দ্বারা কি ইসলাম বাস্তবায়ন করা সম্ভব হতে পারে? কখনো না। এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই তো ইসলাম বাস্তবায়নের পথে বাধা। এটাই তো তাগুত। আলজেরিয়া ও মিশরের অভিজ্ঞতাগুলো কি আমাদের উপদেশের মাধ্যম হতে পারে না? যখন নিজের চোখে আমরা দেখে নিয়েছি যে, ইসলামী দলগুলোর কী অবস্থা হয়েছে?

মনে রাখুন, আমাদের দেশের বড় আলেমগণ একদিনের জন্যও গণতান্ত্রিক রাজনীতিকে আসল মনে করেননি। আল্লামা শাব্বির আহমাদ উসমানী রহ. যদি পার্লামেন্টে গিয়েও থাকেন, তবু তিনি যখন দেখলেন যে, এখানে ইসলামের ব্যাপারে এক কদমও আগানো যাবে না, তখন তিনি তার থেকে পৃথক হয়ে গেলেন। মাওলানা যফর আহমদ উসমানী রহ. সুস্পষ্টভাবে ১৯৭০ এর পরে উলামায়ে কেরামের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন: তারা যেন এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে পৃথক হয়ে যান এবং দ্বীন প্রচারের কাজ শুরু করেন।

মাওলানা ইউসুফ বানুরী রহ. তো বারবার বুঝিয়েছেন যে, নির্বাচনে লড়া ও পার্লামেন্টে যাওয়ার দ্বারা ইসলামের কোন ফায়দা নেই। তাই এ থেকে বিরত থাকা হোক।

তাহলে এই সকল উলামাগণ কি আমাদের আদর্শ নন?

সুতরাং সমাজে বিদ্যমান উলামা, মাদরাসার দায়িত্বশীলগণ, দ্বীনদার জ্ঞানী-গুণী ও জনসাধারণের জন্য এটাই সময়! পাকিস্তানে ইসলাম বাস্তবায়নের জন্য শাসকশ্রেণী ও জেনারেলদের বিরুদ্ধে নিজ নিজ শক্তি নিয়ে উঠে দাড়ান এবং মুজাহিদীনের আন্দোলনগুলোর সহযোগী হয়ে

যান। এই আন্দোলনই পাকিস্তানের পর কাশ্মীরের আযাদী এবং তারপর পুরো উপমহাদেশে ইসলাম বিজয়ের অবতরণিকা প্রমাণিত হবে এবং সমস্ত বিশ্বে চলমান আন্দোলনের সাথে অংশগ্রহণ করে নব উত্থানের গন্তব্যে পৌঁছে যাবে, ইনশা আল্লাহ।

পরিশেষে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক।